৪

কর্মচারি জড়িতকরণ

Employee Involvement

সার্বিক মান ব্যবস্থাপনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো কর্মচারি জড়িতকরণ। সার্বিক মান ব্যবস্থাপনার সকল কাজে কর্মচারিদের কার্যকর ভাবে জড়িত করতে হবে। তা না হলে সার্বিক মানোন্নয়ন সম্ভব হবে না। সে জন্য এই ইউনিটে কর্মচারি জড়িতকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ
এ ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ-৪.১: কর্মচারি জড়িতকরণ : প্রকৃতি ও পদ্ধতি **পাঠ-৪.২: কর্মচারি জড়িতকরণ পদ্ধতি**	

পাঠ-৪.১ কর্মচারি জড়িতকরণ : প্রকৃতি ও পদ্ধতি

-

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- কর্মচারি জড়িতকরণ কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- কর্মচারি জড়িতকরণে ব্যবস্থাপকের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন
- কর্মচারি জড়িতকরণের সুবিধাবলি বর্ণনা করতে পারবেন
- প্রেষণা কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- প্রেষিত শ্রমশক্তি পাওয়ার উপায় কি কি তা বর্ণনা করতে পারবেন
- চাহিদার নানা উপাদানের প্রতি কর্মচারি ও ব্যবস্থাপকদের দৃষ্টিভঙ্গির চিত্রটি বলতে পারবেন
- প্রেষণার চাহিদা সোপান তত্ত্ব কিভাবে কর্মচারি জড়িতকরণকে সহায়তা করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- প্রেষণার দ্বি-উপাদান তত্ত্ব কিভাবে কর্মচারি জড়িতকরণকে সহায়তা করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- কর্মচারি জড়িতকরণে ব্যবস্থাপকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন
- কর্মচারি জরিপ পদ্ধতিটি বুঝিয়ে বলতে পারবেন

সূচনা বক্তব্য

(Introduction)

সার্বিক মান ব্যবস্থাপনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো কর্মচারি জড়িতকরণ। মানুষ ছাড়া কোন কাজই সফলতা পায় না। তাই, সার্বিক মান ব্যবস্থাপনার সকল কাজে কর্মচারিদের কার্যকর ভাবে জড়িত করতে হবে। এই পাঠে কর্মচারি জড়িতকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে শুরু করব কর্মচারি জড়িতকরণ কাকে বলে তা দিয়ে।

কর্মচারি জড়িতকরণ কাকে বলে?

(What is meant by Employee Involvement?)

সার্বিক মান ব্যবস্থাপনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো কর্মচারি জড়িতকরণ। কর্মচারি জড়িতকরণ বলতে সংগঠনের সকল পর্যায়ের সকল কর্মচারিকে সার্বিক মান ব্যবস্থাপনার কাজে অংশগ্রহণ করাকে বোঝায়। এই জড়িতকরণের মাধ্যমে পণ্যের মান ও সম্পদের উৎপাদনশীলতা উভয়কেই উন্নত করা যায় এবং সাংগঠনিক লক্ষ্যকে আরও ভাল ভাবে অর্জন করা যায়। পিটার গ্রেজিয়ার (১৯৮৯) বলেন, " কর্মচারি জড়িতকরণ হলো সকল পর্যায়ের কর্মচারিদের সংগঠনের চিন্তন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত করার একটি পন্থা "। [Employee involvement is a way of engaging employees at all levels in the thinking process of the organization.] এ ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয় যে, সংগঠনের সকল পর্যায়ের মানুষের মধ্যে স্বতন্ত্র্য মৌলিক জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও সৃষ্টিশীলতা রয়েছে যেটাকে প্রকাশ করার সুযোগ দিলে প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি পেতে পারে। তাদের মূল্যবান চিন্তা মান ব্যবস্থাপনাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। এ জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কর্মচারিদের জড়িত করাটা সার্বিক মান ব্যবস্থাপনা অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে মেনে নিয়েছে। পরিশেষে বলা যায়,কর্মচারি জড়িতকরণ হলো সংগঠনের সকল স্তরে কর্মরত কর্মচারিদের সার্বিক মানোন্নয়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে মান ও কার্যপারদর্শিতার উৎকর্ষ সাধন করার একটি পন্থা।

এবার আমরা কর্মচারি জড়িতকরণের সুবিধাবলি নিয়ে আলোচনা করব।

কর্মচারি জড়িতকরণের সুবিধাবলি

(Advantages of Employee Involvement)

১. **উন্নত সিদ্ধান্ত** ঃ সার্বিক মানোন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কর্মচারিদের জড়িতকরণের ফলে যে কোন একটি সমস্যা বা বিষয় পর্যালোচনায় নানা দৃষ্টিভঙ্গি, প্রেক্ষাপট, সংগঠনের বাস্তব অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জানা যায়। ফলে, একটা সমস্যা বা বিষয়ের বহুমাত্রিক তথ্য ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায় এবং উন্নত ও বাস্তবানুগ সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

২. **সহজ বাস্তবায়ন** ঃ এ পন্থায় কর্মচারিরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং এ কারণে তারা নিজেদের সিদ্ধান্তটির অংশ মনে করে। শুধু তা-ই নয়, এই জড়িতকরণের ফলে কর্মচারিদের অহংবোধকে স্বীকৃতি দেয়া হয় ও তাদের কার্যসন্তুষ্টি বাড়ে। ফলে,নিজেদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তারা শতভাগ আত্মনিয়োগ করে এবং সে কারণে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সহজে সাফল্যমন্ডিত হয়।

৩. **মনোবল বৃদ্ধি** ঃ মনোবল হলো দলগত চরিত্র। কর্মচারি জড়িতকরণের ফলে কর্মচারিরা তাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান সাংগঠনিক কাজে লাগানোর সুযোগ পায়। তাদের নিজস্ব বিচার বুদ্ধি কোম্পানির কাজে ব্যবহার করার সুযোগ পায়। এ জন্য তাদের মনে দলীয় সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। সংগঠনের প্রতি আনুগত্য ও ব্যবস্থাপনার প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পায়। সার্বিক বিচারে কর্মচারিদের মনোবল বৃদ্ধি পায়।

৪. **পরিবর্তনকে গ্রহণ** ঃ সার্বিক মান ব্যবস্থাপনা অব্যাহত মানোন্নয়নের একটি প্রক্রিয়া। নিত্য পরিবর্তনশীল পরিবেশকে গ্রহণ করে নতুন প্রক্রিয়া, পদ্ধতি, রীতিনীতি উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সার্বিক মানোন্নয়ন সাধন করা হয়। কর্মচারি জড়িতকরণ পন্থায় সাংগঠনিক কোন পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকল পর্যায়ের কর্মচারিদের জড়িত করা হয় বলে তারা পরিবর্তনকে গ্রহণ করে এবং এর বাস্তবায়নে বাঁধা না দিয়ে বরং তাতে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং পরিবর্তনকে সফল করায় সচেষ্ট হয়।

৫. **উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ** ঃ কর্মচারি জড়িতকরণ পন্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোচনায় সকল পর্যায়ের কর্মচারিদের জড়িত করা হয় বলে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা বা ত্রুটি আছে তা তাৎক্ষণিক ভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং তা সংশোধনের মাধ্যমে প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও কার্যক্ষেত্র উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া সহজ হয়।

৬. **উন্নততর মানবিক যোগাযোগ** ঃ কর্মচারি জড়িতকরণ পন্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোচনায় সকল পর্যায়ের কর্মচারিদের জড়িত করা হয়। ফলে, তাদের মধ্যে সম্পর্ক যেমন গাঢ় হয়, তেমনই পারস্পারিক মানব সম্পর্ক উন্নত হয়। সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত কর্মচারিদের মধ্যে উন্নততর যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়। পারস্পারিক সমস্যা ও বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারে এবং সাংগঠনিক সৌভ্রাতৃত্ব বাড়ে।

৭. **উন্নত শ্রমিক - ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক** ঃ কর্মচারি জড়িতকরণ পন্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোচনায় সকল পর্যায়ের কর্মচারিদের জড়িত করা হয়। ফলে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা একে অপরকে ভাল করে চেনা ও জানার সুযোগ পায় এবং পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনের অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারে। ফলে, শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে দুরুত্ব কমে যায়। পারস্পারিক বিশ্বাস ও আস্থা বাড়ে, বিরোধ কমে এবং উন্নত শ্রমিক - ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক তৈরি হয়।

৮. **সাংগঠনিক অঙ্গীকার বৃদ্ধি** ঃ এই পন্থায় ব্যবস্থাপক ও কর্মচারি মিলে যৌথ ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। সে কারণে নিজেদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রতি তাদের অঙ্গীকার বাড়ে ও ইউনিট পর্যায়ে স্ব স্ব লক্ষ্য অর্জনে গাফিলতি করে না। কেননা, সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ব্যর্থ হলে তারা নিজেরা ব্যর্থ হবে।

৯. **মান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি** ঃ কর্মচারি জড়িতকরণ পন্থায় যৌথ সিদ্ধান্ত হয়। সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে কি কি সমস্যা বা ত্রুটি আছে তা তাৎক্ষণিক ভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং তা সংশোধনের মাধ্যমে প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও কার্যক্ষেত্র উন্নত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। কর্মচারি ও ব্যবস্থাপকগণ উভয়ই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে। ফলে, সার্বিক মান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

এবার আমরা কর্মচারি জড়িতকরণে ব্যবস্থাপকের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব।

কর্মচারি জড়িতকরণে ব্যবস্থাপকের ভূমিকা

(Role of Manager in Employee Involvement)

আমরা জানি সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সার্বিক মান ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়। একই ভাবে কর্মচারি জড়িতকরণ কর্মকান্ডে ব্যবস্থাপকগণ স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন না করলে এটি বাস্তবায়ন কঠিন হবে। এ প্রেক্ষাপটে, সার্বিক মান ব্যবস্থাপনায় কর্মচারিদের জড়িতকরণে ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা কি হবে সে সম্পর্কে গ্রেজিয়ার (১৯৮৯) একটা দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১. **সাহায্যের মনোভাব ঃ** কর্মচারিরা নানা কাজে ব্যবস্থাপকের সাহায্য চায়। বিশেষ করে সার্বিক মান ব্যবস্থাপনার মতো পরিবর্তনকামী ও গতিশীল দর্শন বাস্তবায়নে কর্মচারিরা অনেক বিষয়ে ব্যবস্থাপকের উপর নির্ভরশীল হয়। এ ক্ষেত্রে একজন ব্যবস্থাপক সব ধরনের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন এটাই কাম্য। এ জন্য একজন ব্যবস্থাপকের সাহায্যের মনোভাব থাকতে হবে এবং তিনি স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে কর্মচারিদের সাহায্য করবেন।

২. **রোল মডেল ঃ** রোল বা ভূমিকা হলো অন্যের প্রত্যাশিত আচরণ অর্থাৎ এক জন ব্যবস্থাপক যদি তার কর্মচারিদের প্রত্যাশিত আচরণ করেন, তা হলে সেটাই হবে তার রোল বা ভূমিকা। একজন ব্যবস্থাপকের কাজ ও আচরণ অন্যের জন্য অনুকরণীয় হতে হবে। সার্বিক মান ব্যবস্থাপনায় কর্মচারিদের জড়িতকরণে তার আগ্রহ, কাজ, নেতৃত্ব, আচরণ, অংশগ্রহণ ইত্যাদি এমন হতে হবে যেন অন্যেরা তা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

৩. **প্রশিক্ষক ঃ** সার্বিক মান ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সকল স্তরের সকল কর্মচারিদের অব্যাহত প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়। পরিবর্তনকে ধারণ, লালন ও চর্চা করতে হলে 'প্রশিক্ষণ -বাস্তবায়ন - প্রশিক্ষণ' এই চক্র চালু রাখার বিকল্প নেই। এ জন্য সার্বিক মান ব্যবস্থাপনায় কর্মচারিদের জড়িতকরণের জন্য একজন ব্যবস্থাপক আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষক হিসেবে সার্বক্ষণিক কাজ করবেন।

৪. **সহায়ক ঃ** সার্বিক মান ব্যবস্থাপনায় কর্মচারিদের সক্রিয় জড়িতকরণ করতে হলে তাদেরকে সব ধরনের ভৌত ও মনস্তাত্বিক সুবিধা প্রয়োজন অনুসারে দিতে হবে। এ জন্য একজন ব্যবস্থাপক সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন ও কর্মচারিদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবেন।

৫. **ঘুরে ঘুরে ব্যবস্থাপনা ঃ** ব্যবস্থাপকের এই ভূমিকাটা গতানুগতিক ব্যবস্থাপনার ব্যতিক্রম। একজন ব্যবস্থাপক সব সময় নিজ কক্ষে না বসে থেকে বিভিন্ন কার্যকেন্দ্র ভ্রমণ, কর্মচারিদের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো, তাদের কাজ দেখা, উৎসাহ দেয়া, সামান্য মত বিনিময় করা, কার্যভারাক্রান্ত কর্মচারিকে তাৎক্ষণিক সাহায্য করা ইত্যাদি কাজ করার মাধ্যমে কর্মচারিদের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে। ব্যবস্থাপকদের এই ঘুরে ঘুরে ব্যবস্থাপনা করার ভূমিকা পালন সার্বিক মান ব্যবস্থাপনা কার্যকর করায় ব্যাপক ভাবে সাহায্য করে।

৬. **দ্রুত কার্যক্রম ঃ** দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণে ব্যবস্থাপকের ভূমিকা সকল ক্ষেত্রেই কার্যকর। কর্মচারিরা যে সব অসুবিধার মুখোমুখি হয় ও সমস্যা সমাধানে যে সব বাস্তবানুগ পদক্ষেপ সুপারিশ করে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করলে কর্মচারিরা তাদের কাজ অব্যাহত রাখতে পারে। এটি করলে তাদের কার্য সন্তুষ্টি বাড়ে, তাদের কাজের পরিমাণ বাড়ে ও সংগঠনের প্রতি তাদের আনুগত্য ও অঙ্গীকার বাড়ে।

৭. **স্বীকৃতি প্রদায়ক ঃ** ব্যবস্থাপকদের এই 'কর্মচারিদের কাজের স্বীকৃতি দানের ভূমিকা' সাংগঠনিক কাজে কর্মচারিদের জড়িতকরণ কাজকে ত্বরান্বিত করে। কাজের স্বীকৃতি কর্মচারিদের কাজ করতে উৎসাহ দেয় এবং সংগঠনের প্রতি তাদের আনুগত্য ও অঙ্গীকার বাড়ায়। অবশ্য ব্যবস্থাপকদের এই ভূমিকাটা খুব বিচক্ষণ ভাবে ব্যবহার করতে হবে, তা না হলে হিতে বিপরীত হবে।

এবার আমরা কর্মচারি জড়িতকরণ কার্যসাধন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

কর্মচারি জড়িতকরণ কার্যসাধন পদ্ধতি

(Methods of Executing Employee Involvement)

সার্বিক মান ব্যবস্থাপনা কাজে কর্মচারিদের জড়িতকরণ করার কতকগুলো কার্যকর পদ্ধতি বিশেষজ্ঞগণ সুপারিশ করেছেন। সেগুলো নিয়ে এবার আলোচনা করা হবে। প্রথমে পদ্ধতিগুলোর নাম দেয়া হলোঃ

১। প্রেষণা
২। কর্মচারি জরিপ
৩। ক্ষমতায়ন
৪। টিম
৫। প্রশিক্ষণ
৬। সুপারিশ প্রদান ব্যবস্থা
৭। স্বীকৃতি ও পুরস্কার
৮। পারদর্শিতা মূল্যায়ন
৯। মুনাফার শরিকানা
১০। ইউনিয়নের অংশগ্রহণ

এবার আলোচনা।

১। প্রেষণা

(Motivation)

প্রেষণা হলো মানুষের কাজ করার অনুপ্রেরণা। মানুষের কাজ করার পেছনে একটা না একটা অভিপ্রায় বা অভীপ্সা কাজ করে এবং এই অভিপ্রায়ই তাকে অভীপ্সা পূরণের পথে তাড়িত বা চালিত করে। তাই প্রেষণা সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকলে ব্যবস্থাপকগণ কর্মীদের সার্বিক মানোন্নয়ন কাজে কার্যকর ভাবে জড়িত করতে পারে ও সার্বিক মান ব্যবস্থাপনাকে সফল করতে পারে। আমরা এখন দেখবো প্রেষণা কী ?

প্রেষণা কী ?

প্রেষণা একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির মধ্যে কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। স্টিয়ার ও পর্টার (১৯৯১) বলেন, "প্রেষণা হলো একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া যা মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন বা তাড়নাকে প্রভাবিত করে তার আচরণকে শক্তিয়ায়ন করে, আচরণ করার পথ করে দেয় ও আচরণ বজায় রাখে।" একই ভাবে ক্রেইটনার (১৯৮৯, পৃ.৪২৯) বলেন, "প্রেষণা হলো একটি মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়া যা আচরণের উদ্দেশ্য ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে।" সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার আলোকে প্রেষণা হলো কার্য সম্পাদনে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করার কলা। প্রেষণার মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ কর্মচারিদের অনুপ্রাণিত করে সাংগঠনিক কাজ স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে এবং সাংগঠনিক লক্ষ্যের দিকে তাদের আচরণকে চালিত করে।

কিন্তু এই উদ্বুদ্ধকরণ কাজটি করার উপায় কি ? বিশেষজ্ঞগণ অনেকগুলো উপায় বাতলে দিয়েছেন। তার মধ্যে আমরা প্রভাবশালী তিনটি উপায় বা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব। সেগুলো হলো ঃ চাহিদা সোপন তত্ত্ব, দ্বি-উপাদান তত্ত্ব ও সমতা তত্ত্ব।

চাহিদা সোপন তত্ত্ব

(Hierarchy of Needs Theory)

কর্মচারিদের প্রেষিত করার উপায় হিসেবে আব্রাহাম এইচ. মাস্‌লো (১৯৪৩) চাহিদা সোপন তত্ত্ব দিয়েছেন। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, মানুষের অন্তর্নিহিত কতকগুলো অভাব পূরণের আশায় তারা কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। অতএব, একজন ব্যবস্থাপক যদি সেই অভাবগুলো পূরণ করার ব্যবস্থা করে, তবে কর্মচারিরা সংগঠনের জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত হবে এবং এ ভাবে কর্মচারিদের সার্বিক মান ব্যবস্থাপনার কাজে জড়িত করা যাবে। এবার তত্ত্বটিতে বর্ণিত অভাবগুলো দেখা যাক।

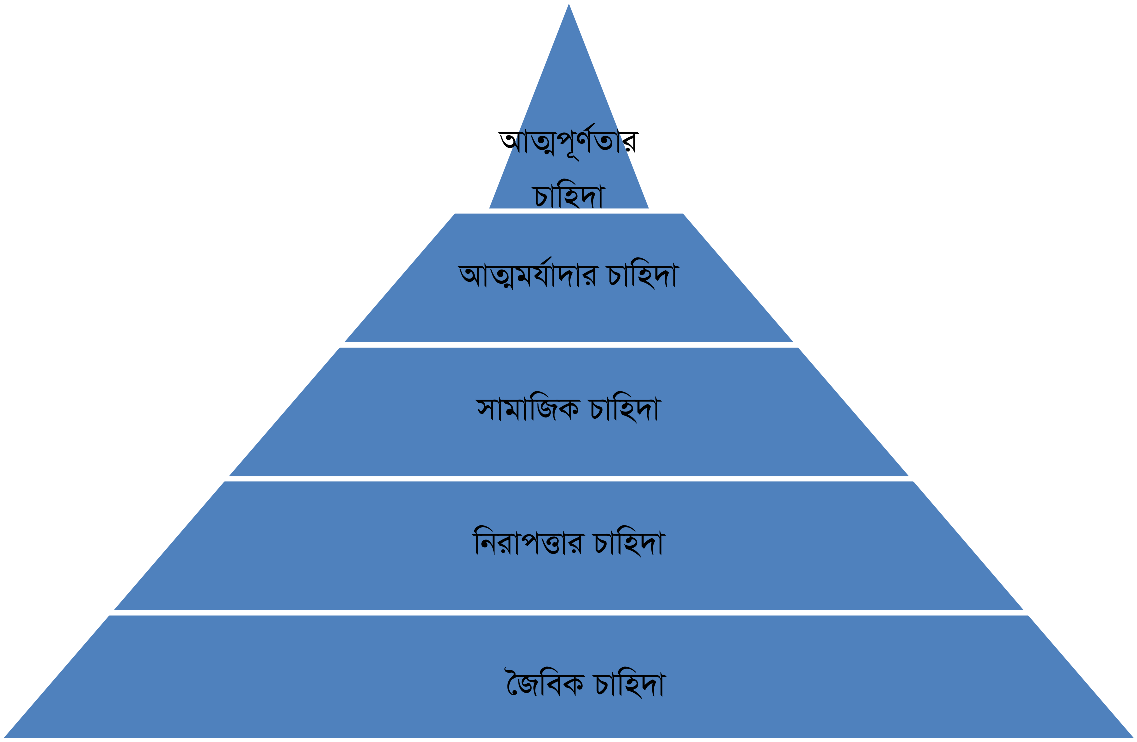

মাস্‌লোর চাহিদা সোপন তত্ত্ব

জৈবিক চাহিদা হলো শারীরিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চাহিদা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি চাহিদা জীব হিসেবে মানুষের জীবন রক্ষার জন্য অপরিহার্য। এগুলো পূরণের জন্য উপযুক্ত বেতন -ভাতা প্রদান করলে এর অভাব পূরণ হবে। মাসলো বলছে এই জৈবিক চাহিদা পূরণ হলে পরবর্তী চাহিদা, নিরাপত্তা লাভের চাহিদার উদ্ভব হবে। ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পাওয়ার চাহিদা হলো নিরাপত্তার চাহিদা। যেমন নিরাপদ কার্য পরিবেশ, যাতায়াতের বাহন, অবেক্ষা সময় পরে চাকুরির স্থায়ীকরণ, পেনশন ব্যবস্থা চালু করা, প্রভিডেন্ড তহবিল চালু করা, স্বাস্থ্য বীমা ও অন্যান্য ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে নিরাপত্তার চাহিদা মেটানো যায়। পরবর্তী উদ্ভুত চাহিদা হলো সামাজিক চাহিদা। মানুষ অন্যের ভালোবাসা, স্নেহ, বন্ধুত্ব, স্বীকৃতি পেতে চায় ও দিতে চায়। এজন্য ব্যবস্থাপকগণ ব্যক্তিকে কোন টিম বা কমিটির সদস্য করবেন, অন্যের সাথে যোগাযোগের জন্য ইন্টারকম ও মোবাইল ফোন ভাতা দিবেন, কার্যদলের ও কমিটির সদস্য করবেন, কাছাকছি বসার ব্যবস্থা করবেন, সভা করবেন ও ক্যান্টিনসহ অন্যান্য কমন সুবিধা দিবেন। এভাবে পারস্পারিক যোগাযোগ ও ভাবের আদান-প্রদান সহজ করবেন। কর্মচারিদের সামাজিক চাহিদা মিটে যাবে ও তারা হৃষ্টচিত্তে কাজে জড়িত হবে।

পরবর্তী উদ্ভুত চাহিদা হলো আত্মমর্যাদার চাহিদা। এটি নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ করা বা নিজের জন্য স্বতন্ত্র্য একটি পরিচয় প্রতিষ্ঠার চাহিদা। এটি নিজেকে গর্বিত ভাবার ও নিজের গুরুত্ব জাহির করার চেষ্টা। এটি পূরণ করার জন্য কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে নিজস্ব সুসজ্জিত অফিস ঘর, পদবি, গাড়ি, প্রটোকল দিতে হবে। তাদের কাছ থেকে পরামর্শ চাইতে হবে। তাদের নিজের কাজের স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণ দিতে হবে। কাজের জন্য প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিতে হবে। তা হলে কর্মচারিরা স্বতঃউদ্বুদ্ধ হয়ে সার্বিক মানোন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করবে। পরবর্তী ও সর্বশেষ উদ্ভুত শীর্ষ চাহিদা হলো আত্মমর্যাদার চাহিদা। এটি মানুষের সৃজনশীলতা ও সম্ভাবনার বিকাশ ও প্রয়োগ করার প্রবল ইচ্ছা। এই চাহিদার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে সকলের মাঝে, এ বিশ্ব সভায় তুলে ধরে। এই চাহিদা পূরণের জন্য কর্মীকে উচ্চতর ডিগ্রি করতে, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে, কনফারেন্স ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে। উচ্চতর পদে পদোন্নতি ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে পদায়ন করতে হবে। কর্মচারি তার চূড়ান্ত লক্ষ্য আত্মপূর্ণতা লাভ করবে ও সংগঠনের জন্য জানপ্রাণ দিয়ে কাজ করবে।

দ্বি-উপাদান তত্ত্ব
(Two-Factor Theory)

ফ্রেডারিক হার্জবার্গ (১৯৬৮) প্রেষণার দ্বি-উপাদান তত্ত্ব প্রদান করেন। তিনি গবেষণা লব্ধ তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে, মানুষ সংগঠনের দুইটি উপাদান দিয়ে প্রভাবিত হয়। একটি হলো রক্ষণাবেক্ষণমূলক বা স্বাস্থ্যগত উপাদান আর অন্যটি হলো প্রেষণামূলক উপাদান। তত্ত্বটির চিত্র নিচে দেয়া হলো। রক্ষণাবেক্ষণমূলক উপাদান অসন্তুষ্টি সৃষ্টি বা প্রতিরোধ করতে পারে এবং লক্ষ্য করলে দেখবেন এগুলো বাহ্যিক উপাদান। এগুলো প্রেষণা সৃষ্টি করে না, তবে অসন্তুষ্টি প্রতিরোধ করে প্রেষণামূলক উপাদানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। আর প্রেষণামূলক উপাদানগুলা কাজের বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত বিধায় সেগুলো অন্তর্নিহিত

দ্বি-উপাদান তত্ত্ব

রক্ষণাবেক্ষণমূলক বা স্বাস্থ্যগত উপাদান বা অসন্তুষ্টিকারক উপাদান	প্রেষণামূলক উপাদান বা সন্তুষ্টিকারক উপাদান
কোম্পানি পলিসি ও প্রশাসন	সাফল্য
কারিগরি তত্ত্বধান	স্বীকৃতি
কাজের পরিবেশ	অগ্রগতি
তত্ত্বধায়কের সাথে সম্পর্ক	প্রদত্ত কাজ
বেতন	দায়িত্ব
মর্যাদা	প্রবৃদ্ধি
নিরাপত্তা	
সহকর্মীদের আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক	
অধস্তনদের সাথে সম্পর্ক	
ব্যক্তিগত জীবন	

উপাদান। এগুলো কর্মচারিদের মধ্যে উদ্দীপনা তৈরি করে, কাজে উদ্বুদ্ধ করে, প্রতিষ্ঠানের প্রতি অঙ্গীকার সৃষ্টি করে, কাজে জড়িত করে এবং সে কারণে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে নিয়োজিত হয়। একজন ব্যবস্থাপককে প্রেষণার উপাদানগুলো ব্যবহারের আগে রক্ষণাবেক্ষণমূলক উপাদান বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

প্রেষণা দিতে হলে মাসলো ও হার্জবার্গ যে উপাদানগুলো চিহ্নিত করেছেন তা অনেকাংশে বাস্তব অবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। তবে, সেগুলো সম্পর্কে ব্যবস্থাপক ও কর্মচারিদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য আছে। সার্বিক মান ব্যবস্থাপনায় কর্মচারি জড়িতকরণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের কর্মচারিদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়ে আমরা কে. কোভিচ (১৯৯৩) পরিচালিত কর্মচারিদের চাহিদা উপাদান ও সে সম্পর্কে ব্যবস্থাপকদের দৃষ্টিভঙ্গির চিত্রটি গ্রহণ করতে পারি। এখানে দেখা যাচ্ছে, আকর্ষণীয় কাজকে কর্মচারিরা ১নং বললেও ব্যবস্থাপকগণ এটাকে ৫নং জায়গা দিয়েছে। ব্যবস্থাপকরা বেতনকে ১নং বললেও কর্মচারিরা এটাকে ৫নং জায়গা দিয়েছে।

অভাবের উপাদান	কর্মচারিদের রেটিং	ব্যবস্থাপকদের রেটিং
আকর্ষণীয় কাজ	১	৫
প্রশংসা	২	৮
জড়িতকরণ	৩	১০
কাজের নিরাপত্তা	৪	২
ভাল বেতন	৫	১

পদোন্নতি /প্রবৃদ্ধি	৬	৩
ভাল কাজের পরিবেশ	৭	৪
কর্মচারিদের প্রতি আনুগত্য	৮	৭
ব্যক্তিগত সমস্যায় সহায়তা	৯	৯
কুশলী শৃঙ্খলা	১০	৬

প্রেষিত শ্রমশক্তি পাওয়ার উপায়

প্রেষণা দানের কার্যক্রম পরোক্ষ ভাবে মানুষকে প্রেষিত করে। প্রেষণা একটি মনস্তাত্বিক বিষয়। সেজন্য ব্যক্তিকে নিজে অনুপ্রাণিত হতে হয়। ব্যবস্থাপনা এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে পারে যাতে ব্যক্তি নিজে প্রেষিত হতে পারে। কিভাবে প্রেষিত শ্রমশক্তি পাওয়া যায় সে সম্পর্কে কিন্নি (১৯৯৩) কতকগুলো পথনির্দেশ করেছেন। সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১. **নিজেকে জানুন ঃ** ব্যবস্থাপককে নিজের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে হবে। এটি তিনি নিজে আত্ম বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে জানতে পারেন, নিকট জনের মন্তব্য থেকে জানতে পারেন এবং সহকর্মী ও অধস্তন কর্মচারিদের অনানুষ্ঠানিক গোপন মন্তব্য থেকে জানতে পারেন। প্রেষণাদানকারী ব্যবস্থাপকদের বুঝতে হবে যে, মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এবং কর্মচারিদের লক্ষ্য অর্জনের উপর তাদের সাফল্য নির্ভর করে।

২. **কর্মচারিদের জানুন ঃ** কর্মচারিদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, মেধা, কার্যপারদর্শিতার প্রতিবেদন, সুপারিশপত্র, সাফল্য,ব্যর্থতা ইত্যাদি নথি বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থাপকের নিজের আন্তঃব্যক্তিক অভিজ্ঞতার সার্বিক পর্যালোচনা করে একজন কর্মচারির শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে জানা যায়। কর্মচারি সম্পর্কে সঠিক জানা থাকলে তার শক্তিকে কাজে লাগানো যায়।

৩. **একটা অনুকূল মনোভাব প্রতিষ্ঠা করুন ঃ** ব্যবস্থাপক সব সময়ে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করবেন। হতাশাবাদী হওয়া ভাল নয়। কর্মচারিদের কাজের ফলাবর্তন হতে হবে গঠনমূলক ও ইতিবাচক। কর্মচারিদের প্রতি সম্মান ও সংবেদনশীল হলে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে। তাদেরকে কাজ ও সমস্যা সম্পর্কে সহযোগিতামূলক পরিবেশ গড়ে ওঠে। কর্মচারিদের মূল্যবান পরামর্শ দ্রুত বাস্তবায়ন করা ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে।

৪. **লক্ষ্য অংশীদারিত্ব ভিত্তিক লক্ষ্য নির্ধারণ করুন ঃ** কর্মচারিদের সাথে আলোচনা করে লক্ষ্য নির্ধারণ করলে কর্মচারিদের প্রেষণা বাড়ে।

৫. **অগ্রগতি পরিধারণ করুন ঃ** কর্মচারিদের কাজের অগ্রগতি নিয়মিত পরিধারণ বা মনিটরিং করতে হবে এবং একটা নিয়মিত বিরতি দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের নিয়ে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে। বিচ্যুতি চিহ্নিত করে যৌথ ভাবে তা সংশোধনের পদক্ষেপ নিতে হবে।

৬. **আকর্ষণীয় কাজ তৈরি করুন ঃ** মানুষ গতানুগতিক ও একঘেয়েমী কাজ পছন্দ করে না। তারা অপ্রচলিত, চ্যালেঞ্জিং কাজে খুবই আনন্দ পায় ও উদ্যমের সাথে তা সমাধা করে সৃষ্টির সুখ পায়। এজন্য কর্মচারিদের কাজের নক্শা করার সময় কিছু চ্যালেঞ্জিং কাজ, বর্ধিত কাজ ও উচ্চ পর্যায়ের কাজ সংযুক্ত করতে হবে।

৭. **কার্যকর যোগাযোগ করুন ঃ** কর্মচারিদের সাথে উন্মুক্ত ও বহুমুখি যোগাযোগ মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে যাতে তারা তাদের মনের কথা নিদ্বিধায় প্রকাশ করতে পারে। কার্যকর যোগাযোগ মূল সমস্যা উন্মোচিত করে ও সমাধান সহজ করে।

৮. **সাফল্য পালন করুন ঃ** কর্মচারিদের কাজের সাফল্য আনুষ্ঠানিক ভাবে পালন করতে হবে ও প্রকাশ্যে তাদের কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে। কর্মচারিরা আত্মবিশ্বাস ও আস্থা ফিরে পাবে ও প্রেষিত হয়ে কাজে আত্মনিয়োগ করবে।

২। কর্মচারি জরিপ

(Employee Survey)

কর্মচারি জরিপ করার মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ কর্মচারিদের বর্তমান মনোভাব, প্রদত্ত ক্ষমতায়ন সম্পর্কে তাদের মতামত, ব্যবস্থাপকদের সাথে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের ধরন, সার্বিক মান ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন কাজের কার্যকারিতা সম্পর্কে তাদের মতামত, কাজের অগ্রগতির ধারা, উন্নয়নের ক্ষেত্র, কার্যকর যোগাযোগের জন্য করণীয় ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। একটি আদর্শ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে এই জরিপ পরিচালনা করলে বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় এবং তার ভিত্তিতে সঠিক মান্নোয়ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। এজন্য কর্মচারি জড়িতকরণে এটি একটি কার্যকর হাতিয়ার।

সারসংক্ষেপ:

সার্বিক মান ব্যবস্থাপনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো কর্মচারি জড়িতকরণ। কর্মচারি জড়িতকরণ বলতে সংগঠনের সকল পর্যায়ের সকল কর্মচারিকে সার্বিক মান ব্যবস্থাপনার কাজে অংশগ্রহণ করাকে বোঝায়। সার্বিক মানোন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কর্মচারিদের জড়িত করলে উন্নত সিদ্ধান্ত ও কর্মচারিদের মনোবল বাড়ে। কর্মচারি জড়িতকরণে ব্যবস্থাপকের সহায়ক ও কার্যকর ভূমিকা আছে। তারা রোল মডেল হিসেবে কাজ করে। কর্মচারি জড়িতকরণ কার্যসাধন পদ্ধতি হলো প্রেষণা, কর্মচারি জরিপ, ক্ষমতায়ন, টিম, প্রশিক্ষণ, সুপারিশ প্রদান ব্যবস্থা, স্বীকৃতি ও পুরস্কার, পারদর্শিতা মূল্যায়ন, মুনাফার শরিকানা, ইউনিয়নের অংশগ্রহণ। প্রেষণা একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির মধ্যে কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। প্রেষণার দুটি তত্ত্ব চাহিদা সোপান তত্ত্ব ও দ্বি-উপাদান তত্ত্ব ব্যবহার করে কর্মচারিদের উৎসাহিত করে কাজে জড়িত করা যায়। কতকগুলো কার্যক্রম গ্রহণ করলে প্রেষিত শ্রমশক্তি পাওয়া যায়। কর্মচারি জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যবস্থাপকগণ কর্মচারিদের বর্তমান মনোভাব জানতে পারে ও সে অনুসারে ব্যবস্থা নিলে তাদেরকে সার্বিক মান ব্যবস্থাপনায় জড়িত করা যায়।

পাঠ-৪.২ কর্মচারি জড়িতকরণ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ক্ষমতায়ন বলতে কি বোঝায় তা বলতে পারবেন
- ক্ষমতায়ন করার দিকনির্দেশনা কি কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- টিম কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- টিমে সিদ্ধান্ত নেয়ার পদ্ধতিগুলো তা বর্ণনা করতে পারবেন
- টিম গঠন করা হয় কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- সফল টিমের বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন
- টিম সদস্যদের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন
- টিমের সভা কার্যকর করা যায় কিভাবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- টিম অগ্রগতির সাধারণ প্রতিবন্ধকতাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- কার্যকর ও ফলপ্রসু প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যে দিকনির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে তা বর্ণনা করতে পারবেন
- সুপারিশ ব্যবস্থা কার্যকর ভাবে ব্যবহার করার জন্য কিছু নিয়মকানুন অনুসরণ করা দরকার তা বর্ণনা করতে পারবেন
- কার্যপারদর্শিতা মূল্যায়ন করা দরকার কেন তা বলতে পারবেন
- কার্যপারদর্শিতা মূল্যায়ন কিভাবে কর্মচারি জড়িতকরণে সহায়তা করে তা বর্ণনা করতে পারবেন
- স্বীকৃতি ও পুরস্কার কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- স্বীকৃতি ও পুরস্কার ব্যবস্থাকে কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য করতে হলে যে পদক্ষেপগুলো নিতে হবে তা বর্ণনা করতে পারবেন
- মুনাফার শরিকানা পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন

সূচনা বক্তব্য

সার্বিক মান ব্যবস্থাপনার কাজে কর্মচারিদের জড়িত করতে পারলে এর বাস্তবায়নে কর্মচারিদের তরফ থেকে কোন বাঁধা থাকে না এবং সার্বিক মান ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন সফল হয়। কর্মচারি জড়িতকরণ কাজকে সফল করতে হলে যে কাজগুলো করা দরকার তার কয়েকটির আলোচনা আগের পাঠে হয়েছে। এই পাঠে বাকী পদ্ধতিগুলো আলোচনা করা হবে। প্রথমে ক্ষমতায়ন দিয়ে শুরু হবে।

৩। ক্ষমতায়ন (Empowerment)

ক্ষমতায়ন হলো কর্মচারি জড়িতকরণের তিন নম্বর কাজ। ক্ষমতায়ন বলতে স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যক্তিক সক্ষমতা তৈরি করাকে বোঝায়। ক্ষমতায়ন ব্যক্তির নিজের জীবন ও অধিকারের উপর আস্থা তৈরি করে ও ব্যক্তিকে তার যৌক্তিক ব্যবহারে দক্ষ ও শক্তিশালী করে তোলে। এ প্রেক্ষিতে ক্ষমতায়ন হলো নিজস্ব কর্তৃত্বের আওতাধীনে দায়িত্বশীল ও স্বনিয়ন্ত্রিত উপায়ে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও কার্যসম্পাদন করার যোগ্য করার জন্য ব্যক্তির স্বায়ত্বশাসন ও স্বনিয়ন্ত্রণের মাত্রা বৃদ্ধি করার কতকগুলো পদক্ষেপ। ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ব্যক্তির অপার সম্ভাবনাকে ব্যবহার করে সাংগঠনিক উন্নয়ন সাধন করা হয়। ক্ষমতায়ন বলতে বেস্টারফিল্ড ও অন্যান্য (২০১৯, পৃ. ৯৫) বলেন, " ক্ষমতায়ন হলো একটা পরিবেশ যেখানে সাংগঠনিক মূল্যবোধ ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্ধারিত আওতার মধ্যে প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ও ক্রেতার প্রয়োজন সন্তুষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের উদ্‌যোগ গ্রহণ করার দায়িত্ব ও মালিকানা নেয়ার মতো যোগ্যতা, আত্মবিশ্বাস ও অঙ্গীকার মানুষের আছে।" তাহলে দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতায়ন একটা ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ব্যক্তির, সংগঠনের বা কমউিনিটির সক্ষমতা

বৃদ্ধি করা হয়, যেন তারা তাদের নিজেদের কর্ম, জীবন ও জীবিকার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই সক্ষমতা ব্যক্তিকে সাংগঠনিক মানোন্নয়ন কাজে জড়িত হতে উৎসাহিত করে।

ক্ষমতায়ন করার দিকনির্দেশনা

কার্যকর ক্ষমতায়ন করতে ডিমিট্রিয়াডস (২০০১,পৃ,১৯-২৮) কতকগুলো দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। অনুসরণীয় নির্দেশনাগুলো এবার বর্ণনা করা হলো -

১. কর্মচারিদের সার্বিক মান ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সম্পর্কে বোঝাতে হবে। প্রত্যাশিত পরিবর্তন যে প্রয়োজন সেটি তথ্য ও উদাহরণ দিয়ে বোধগম্য ভাষায় লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমে সকল কর্মচারিকে অবহিত করতে হবে ও পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে প্রণোদিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, পরিবর্তন চাপিয়ে দিলে ফলপ্রসু হয় না।

২. সার্বিক মান ব্যবস্থাপনায় কর্মচারিদের জড়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক পরিবর্তন করতে হবে। নিয়ম-নীতি, কার্য কাঠামো, নেতৃত্বের ধরন, ব্যবস্থাপনা কৌশল ইত্যাদি পরিবর্তন করতে হবে, যেন নতুন চিন্তা সংগঠন ধারণ, লালন ও চর্চা করতে পারে।

৩. কর্মচারিদের যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে সার্বিক মান ব্যবস্থাপনায় জড়িতকরণ করায় সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে।

৪. কর্মচারিদের তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জড়িত করতে হবে। যার যার কর্মক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর্মকান্ডে তাদেরকে জড়িত করে যৌথ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৫. কর্মচারিদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব হস্তান্তর করতে হবে, যেন তারা সাংগঠনিক কাজে স্বাধীনতা পায় ও নিজের মেধা ও মননশীলতাকে ব্যবহার করে সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করে সার্বিক মান ব্যবস্থাপনায় নিজেকে জড়িত করতে পারে।

৬. কর্মচারিদের সংশ্লিষ্ট তথ্য ভান্ডারে প্রবেশ অধিকার দিতে হবে। তাহলে তারা সঠিক ও কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

৭. কর্মচারিদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ দিতে হবে। তা না হলে কাজ বিলম্বিত হবে বা ত্রুটিযুক্ত হবে বা আদৌ হবে না।

৮. ক্ষমতায়নের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমস প্রবর্তন করতে হবে। সার্বিক মান ব্যবস্থাপনায় কর্মচারিদের জড়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি, কার্য কাঠামো, নেতৃত্বের ধরন, ব্যবস্থাপনা কৌশল ইত্যাদি পরিবর্তন করতে হবে, যেন নতুন চিন্তা সংগঠন ধারণ, লালন ও চর্চা করতে পারে।

৯. আমলাতান্ত্রিক বাঁধা ও অপ্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণগুলো অপসারণ করতে হবে। ফলশ্রুতিতে, কর্মচারিরা যৌক্তিক মাত্রার মুক্ত পরিবেশে কাজ করার স্বায়ত্বশাসন পায় ও কাজের গতি ঠিক রাখতে পারে।

১০. কর্মচারিদের উপর বিশ্বাস ও আস্থা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে। ফলে, কর্মচারিদের সাথে ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক মধুর হয় ও কর্মচারিরা নিজেদের সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভাবতে পারে। এ কারণে, তাদের কাজের সাথে জড়িত হওয়ার উৎসাহ বাড়ে।

১১. কর্মচারিদের তাদের প্রয়োজনের সময় পেশাগত উপদেশ/প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিতে হবে। ব্যবস্থাপনা উৎসাহের সাথে আগেভাগে প্রয়োজন ঠিক করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং 'খোলা দ্বার নীতি' গ্রহণ করে কর্মচারিদের যখনই প্রয়োজন প্রত্যাশিত পেশাগত উপদেশ/পরামর্শ দিবে।

১২. কর্মচারিদের নবউদ্যোগ ও সমস্যা সমাধানের চেষ্টাকে উৎসাহ ও সহায়তা দিতে হবে। ব্যবস্থাপনা এ ক্ষেত্রে সব ধরণের প্রশাসনিক ও কারিগরি সুবিধা প্রদান করবে।

১৩. কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও অর্জনকে স্বীকৃতি দিতে হবে। কাজের স্বীকৃতি কর্মচারিদের কাছে উত্তম প্রেষণা হিসেবে কাজ করে এবং তারা সাংগঠনিক কাজে অংশগ্রহণের প্রবল উৎসাহ পায়।

১৪. কর্মচারিদের দায়িত্ব ও অবদানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পুরস্কার প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। এই পুরস্কার আর্থিক ও অ-আর্থিক উভয় প্রকারই হতে পারে। পুরস্কার কর্মচারিদের সব সময়েই সাংগঠনিক কাজে অংশগ্রহণের প্রবল উৎসাহ যোগায়।

১৫. ক্ষমতার নৈতিক ব্যবহারের জন্য দায়দায়িত্ব নিশ্চিত করতে হবে। নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতা ব্যক্তিকে স্বৈরাচারী করে তোলে যা সাংগঠনিক বিপর্যয় আনে। ক্ষমতা দেয়ার সাথে সাথে তার যথাযথ ব্যবহার না করলে কর্মীকে দায়ী করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৪। টিম (Team)

কর্মচারি জড়িতকরণ কাজকে ফলপ্রসু করার জন্য টিম খুবই কার্যকর। এই কাজে নানা প্রকারের টিমের ব্যবহার করা হয়। সার্বিক মান ও উৎপাদনশীলতার সমস্যা সমাধানে টিম মহৌষধি না হলেও বেশ কার্যকর।

টিম কাকে বলে

একদল মানুষ যখন কোন একটা সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে, তখন ঐ দলকে টিম বলে। টিম কোন এক বিশেষ কাজ করার জন্য গঠন করা হয়। তাই, লক্ষ্য অর্জনে কাজে লাগে এমন নানামুখি অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মানুষ নিয়ে টিম গঠিত হয়। মুরহেড ও গ্রিফিন (১৯৯৯, পৃ. ৩২৫) বলেন, "টিম হলো পরিপূরক দক্ষতা সম্পন্ন মানুষের একটি ছোট দল যারা একটি সাধারণ উদ্দেশ্য, কার্যপারদর্শিতার একটি সাধারণ লক্ষ্য ও একটি প্রচেষ্টার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ, যার জন্য তারা পারস্পারিক ভাবে নিজেদেরকে দায়ী করে"। [A team is a small number of people with complementary skills who are committed to a common purpose, common performance goals and an approach for which they hold themselves mutually accountable.] এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, টিম হলো একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে পরস্পরকে সহায়তা করতে পারে এমন একদল অঙ্গীকারাবদ্ধ মানুষ যারা সম্মিলিত ভাবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে।

টিম গঠন করা হয় কেন ?

১. কোন একজন ব্যক্তির জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে একটি কাজ যখন করা যায় না, তখন প্রয়োজনীয় বহুমুখী জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক নিয়ে টিম গঠন করা হয়। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জন করতে দক্ষতার কোন ঘাটতি হয় না।

২. টিম সদস্যদের পারস্পারিক সহায়তা থেকে অর্জিত সমন্বিত জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত ক্ষমতায়নে ও সার্বিক মান ব্যবস্থাপনায় অধিক কার্যকর হয়।

৩. টিম সদস্যদের মধ্যে পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়ায় তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ফলে, নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ও কাজের সমন্বয় সাধন সহজ হয়। তাই, কাজের গতি বাড়ে ও লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।

৪. টিম সদস্যদের মধ্যে তথ্য, মত ও ভাবের মুক্ত বিনিময় হয় বলে লক্ষ্য অর্জনের পথে উদ্ভুত বাঁধাগুলো সহজে চিহ্নিত ও দূর করা যায়। ফলে, যথা সময়ে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়।

টিমের ধরণ

সার্বিক মান ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদন করার জন্য নানা ধরনের টিম গঠন করা হয়। কর্মচারি জড়িতকরণের জন্য যে সব টিম ব্যবহার করা হয় সেগুলো হলো ঃ

১. প্রক্রিয়া উন্নয়ন টিম [Process Improvement Team] ঃ একই কার্য বিভাগের বিভিন্ন কার্য ইউনিট, বহিঃস্থ ক্রেতা ও বহিঃস্থ সরবরাহকারীদের নিয়ে ৬ থেকে ১০ জন সদস্য বিশিষ্ট টিম গঠন করা হয় এবং এদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি হয়ে টিম পরিচালনা করেন।

২. বহুক্রিয়াকারী টিম [Cross Functional Team]ঃ বিভিন্ন কার্যবিভাগ থেকে নিয়ে ৬ থেকে ১০ জন সদস্য বিশিষ্ট টিম গঠন করা হয়। প্রয়োজনে ক্রেতা ও সরবরাহকারীদের প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে নেয়া যায়। সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি হয়ে টিম পরিচালনা করেন।

৩. **স্বাভাবিক কাজের টিম** [Natural Work Team] ঃ কার্যবিভাগের সকলকে নিয়ে এই টিম গঠিত হয় এবং ব্যবস্থাপক টিমের সভাপতি হন।

৪. **স্বপরিচালিত / স্বশাসিত কাজের টিম** [Self Directed/ Managed Work Team] ঃ কার্যবিভাগের সকলকে নিয়ে এই টিম গঠিত হয়। এই টিম কার্যকেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকে। কার্যবিভাগের প্রধান ব্যবস্থাপকই প্রদান নির্বাহী হন। একজন সমন্বয়ক উর্ধতন ব্যবস্থাপনার সাথে যোগসূত্র রাখে।

সফল টিমের বৈশিষ্ট্যাবলি

একটি টিমকে সফল ভাবে কাজ করতে হলে টিমের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে তা নিয়ে বেস্টারফিল্ড ও অন্যান্য (২০১৯, পৃ. ৯৯) একটি তালিকা দিয়েছেন। সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

১. **স্পন্সর / দায়িত্ব** ঃ টিমের সদস্যদের মধ্যে একজন টিমের দায়িত্বে থাকবেন। তিনি মান কাউন্সিলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। সাধারণত মান কাউন্সিলের একজন টিমের স্পন্সর হন। এতে করে সংযোগ ও সাংগঠনিক সুযোগ-সুবিধা দু'টোই পাওয়া যায়।

২. **টিম সনদ** ঃ টিমের মিশন, কার্য আওতা, কর্তৃত্ব, কাজ, সম্পদ, ইত্যাদিসহ সকল সদস্য ও সহায়ক কর্মচারিদের কাজ ও দায় নির্দিষ্ট করে একটা সনদ বা সংবিধি টিমের জন্য থাকতে হবে।

৩. **টিমের গঠন** ঃ টিমের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ১১ জনের বেশী হবে না এবং সংখ্যা যা-ই হোক তা হবে বেজোড় সংখ্যা।

৪. **প্রশিক্ষণ** ঃ টিমের সদস্যদের সমস্যা সমাধান, টিমের গতিশীলতা ও যোগাযোগ দক্ষতার উপর ভাল ভাবে প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

৫. **বিধি-বিধান** ঃ টিমের জন্য একটা কার্যবিধি সকলের সঙ্গে আলোচনা করে নির্ধারণ করতে হবে এবং মাঝে মাঝে তা পর্যালোচনা করে পুনঃনির্ধারণ করতে হবে।

৬. **স্পষ্ট উদ্দেশ্য** ঃ টিমের উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে যাতে কোন প্রকার ভুল বোঝাবুঝি না থাকে এবং প্রত্যেক সদস্যকে তা অবহিত করতে হবে।

৭. **দায়দায়িত্ব** ঃ টিমের দায়িত্ব পালনের কালান্তিক প্রতিবেদন মান কাউন্সিলের কাছে পাঠাতে হবে।

৮. **সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া** ঃ টিমের সিদ্ধান্ত নেয়ার নিয়ম-নীতি স্পষ্ট ভাবে বলা থাকবে এবং টিমকে কার্যকর, গ্রহণযোগ্য, সময় মতো সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৯. **সম্পদ** ঃ টিমের কাজ সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ ও তথ্য ভান্ডারে প্রবেশের সুযোগ দিতে হবে।

১০. **আস্থা** ঃ টিমের সদস্যদের মধ্যে পারস্পারিক আস্থা থাকতে হবে এবং ব্যবস্থাপনারও টিমের দক্ষ কার্যসম্পাদন ক্ষমতার উপর আস্থা থাকতে হবে।

১১. **কার্যকর সমস্যা সমাধান** ঃ আবেগ বা যেনতেন ভাবে সমস্যার সমাধান না দিয়ে যৌক্তিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সমস্যার সমাধান দিতে হবে।

১২. **উন্মুক্ত যোগাযোগ** ঃ টিমের সদস্যদের মধ্যে বাঁধাহীন যোগাযোগ থাকতে হবে। সদস্যরা অন্যের কথা মনোযোগের সাথে শুনবে, অন্যকে কথা বলতে বাঁধা দিবে না, বক্তব্য স্পষ্ট ও সরাসরি দিতে হবে, সমস্যা হলে প্রশ্ন করতে হবে এবং মনের কথা রাখঢাক না করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে হবে।

১৩. **উপযুক্ত নেতৃত্ব** ঃ টিম ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক, অংশগ্রহণমূলক ও গতিশীল নেতৃত্ব দিতে হবে।

১৪. **ভারসাম্যমূলক অংশগ্রহণ** ঃ টিমের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনে টিমের সকল সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ দরকার। এজন্য সকলে তাদের মতামত দিবে, জ্ঞানের অংশী করবে ও অন্যকে অংশগ্রহণ করতে প্রণোদিত করবে।

১৫. **সৌহার্দ্য** ঃ টিমের সদস্যদের মধ্যে পারস্পারিক সৌহার্দ্যতা, পরমত সহিষ্ণুতা ও অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে। তা হলে টিমের গতি বাড়ে।

টিম সদস্যদের ভূমিকা

[ক] টিম নেতার ভূমিকা

১. টিমের সাবলিল ও কার্যকর কার্যসম্পাদন নিশ্চিত করা, রেকর্ড রাখার কাজ অর্পণ ও চালনা করা, কর্মকান্ডের মধ্যে ঐক্য তৈরি করা ও প্রতিবেদন তৈরি ও উপস্থানের কাজ তত্ত্বাবধান।
২. টিমের কার্যক্রমের প্রক্রিয়া সম্পাদনে সহায়তা করা, সভায় সকল সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, কোন সদস্যের আধিপত্য করতে না দেয়া এবং ইতিবাচক আন্তঃব্যক্তিক আচরণ করা।
৩. টিম ও মান কাউন্সিল বা স্পন্সরের মধ্যে যোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা।
৪. টিম কর্তৃক সুপারিশকৃত পরিবর্তন, সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা ও টিম-কাজের আওতা বাস্তবায়নের কাজগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।
৫. টিম সদস্যদের মর্যাদা ও অর্জনসমূহ পরিধারণ করা এবং নির্ধারিত সময়ে টিমের কাজ সম্পাদনে নিশ্চয়তা দান।
৬. টিমের সভার আলোচ্যসূচি প্রস্তুত করা।
৭. টিমের সকল সদস্যের ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া।

[খ] টিম সদস্যদের ভূমিকা

১. কোন রকম আপত্তি না করে সেরা অবদান রাখা।
২. টিমের অন্য সদস্যদের অবদানকে সম্মান দেখান।
৩. অন্যের বক্তব্য মনোযোগের সাথে শুনুন ও ধারণা স্পষ্ট করার জন্য প্রশ্ন করা।
৪. স্বতঃস্ফুর্ত থাকা।
৫. ঐক্যমতের জন্য কাজ করা।
৬. টিমের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা।
৭. টিমের অন্য সদস্যদের আস্থা করা, সহায়তা করা ও সত্যিকার উদ্বিগ্ন হওয়া।
৮. টিমের উদ্দেশ্য জানা, বোঝা ও অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া।
৯. ব্যক্তিক পার্থক্য শ্রদ্ধা করা ও সহ্য করা।
১০. নিজের আচরণের ফলাবর্তন পাওয়ার জন্য অন্যকে উৎসাহিত করা।
১১. দ্বন্দ্বকে প্রকাশ্যে স্বীকার করা ও এর মাধ্যমে কাজ করা।
১২. দুই সভার মাঝখানে প্রদত্ত কাজ শেষ করা।
১৩. টিমের অন্য সদস্যদের সৎ ও আন্তরিক প্রশংসা করা।

টিমে সিদ্ধান্ত নেয়ার পদ্ধতি

ফ্রহম্যান (জুলাই, ১৯৮৯) টিমে সিদ্ধান্ত নেয়ার চারটি পদ্ধতির কথা খুঁজে পেয়েছেন। সেগুলি নিচে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. **ঐকমত্য ঃ** টিমের সকল সদস্য একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। এটি সবচেয়ে কার্যকর সিদ্ধান্ত।
২. **সংখ্যা গরিষ্ঠতা ঃ** টিমের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্য যে প্রস্তাবের পক্ষে থাকবে, সেটি সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হবে।
৩. **করতালি ঃ** কোন প্রস্তাবের পক্ষে করতালি পড়লে সেটিকে সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হবে।
৪. **একপাক্ষিক ঃ** টিমের নেতা নিজে একক ভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন। এ ক্ষেত্রে টিম নেতার কাছে সকল তথ্য থাকতে হবে এবং নেতাকে জানতে হবে যে, টিমের অন্য সদস্যরা এর বিরোধিতা করবে না।
৫. **সংখ্যা লঘিষ্ঠতা ঃ** অনেক সময় সংখ্যা লঘিষ্ঠ সদস্যের মতকে অন্যরা বিরোধ এড়ানোর জন্য গ্রহণ করে নেয়। এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সদস্যদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ পাওয়া যায় না।
৬. **কোন সিদ্ধান্ত না নেয়া ঃ** এটি সবচেয়ে খারাপ অবস্থা। কোন সিদ্ধান্ত ছাড়া সভা শেষ করা হয়।

টিমের সভা কার্যকর করা যায় কিভাবে?

টিমের সভা কার্যকর করতে হলে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সুচারু ভাবে সম্পাদন করতে হবে ঃ

১. টিমের সভার নিয়মিত সময়সূচি থাকবে। সভা নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে শুরু করতে হবে। সভার আলোচ্যসূচি, সময় ও স্থান উল্লেখ করে সভার বিজ্ঞপ্তি সকল সদস্যকে আগেভাগে জানাতে হবে।
২. সভার আলোচ্যসূচি সকলের সাথে কথা বলে, বিভিন্ন চাহিদা ও সমস্যা বিবেচনা করে প্রণয়ন করতে হবে।
৩. আলোচ্যসূচির ক্রম থাকবে। সভার উদ্বোধনী বক্তব্য, পূর্ব সবার সিদ্ধান্ত অনুসমর্থন, বাস্তবায়িত কাজের বিবরণ, আলোচ্যসূচির উপর আলোচনা, সমাপনী বক্তব্য, সভার স্থগিত ঘোষণা।
৪. সভায় সদস্যদের বক্তব্য দেয়ার নির্ধারিত সময় থাকবে, অন্যের প্রতি বিরুপ মন্তব্য করতে দেয়া যাবে, সকলকে বক্তব্য দেয়ার সুযোগ দিতে হবে।
৫. সকলের বক্তব্যের সার সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করতে হবে ও সভা শেষ হওয়ার আগে সেগুলোর মূল বক্তব্য জানাতে হবে।
৬. নির্ধারিত সময়ে সভা শেষ করতে হবে।

টিম অগ্রগতির সাধারণ প্রতিবন্ধকতাসমূহ

১. টিম সদস্যদের অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ।
২. সামঞ্জস্যহীন পুরস্কার ও বেতন।
৩. প্রথম পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়কদের টিমের কাজের বিরোধিতা।
৪. টিমের কাজ, সম্পদ, দায়দায়িত্ব, ক্ষমতা ও আওতা সম্পর্কিত পরিকল্পনার অভাব।
৫. ব্যবস্থাপনার সহায়তার অভাব।
৬. সংগঠনের তথ্য ভান্ডারে টিমের প্রবেশ করতে না পারা।
৭. ইউনিয়ন সহায়তার অভাব।
৮. প্রকল্পের কাজের অতিরিক্ত আওতা।
৯. প্রকল্পের উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, ফলে টিম সদস্যরা কাজ করতে প্রেষণা পায় না।
১০. সাফল্য পরিমাপের কোন স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য পরিমাপক নেই।
১১. মানোন্নয়ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ না থাকা, বৈরি সাংগঠনিক মূল্যবোধ ও বিশ্বাস ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতির হস্তক্ষেপ।
১২. অত্যধিক বড় টিম হওয়ার কারণে সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হয় বা সিদ্ধান্ত নিতে না পারা।
১৩. দলীয় চিন্তায় আটকে থাকা। টিমের সকলকে জড়িত করতে গিয়ে শুধু আলোচনাই হয়, ঐক্যমত হয় না।

৫। প্রশিক্ষণ (Training)

প্রশিক্ষণ কর্মচারিদের কাজের দক্ষতা বাড়ায়। আমরা জানি সার্বিক মান ব্যবস্থাপনা একটি টিম কাজ। টিম কাজে অংশগ্রহণের জন্য ও মানোন্নয়ন কাজে জড়িত হওয়ার জন্য টিমের সদস্যদের কতিপয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার। কার্যকর ও ফলপ্রসু প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যে দিকনির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে তা নিচে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. মান কাউন্সিল প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম তৈরিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।
২. প্রশিক্ষণ হবে হাতে-কলমে। বাস্তব অবস্থায় কিভাবে টিমের কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে তা হাতে-কলমে করে দেখাতে হবে।

৩. প্রশিক্ষণ হবে গ্রহণযোগ্য ও মানসম্পন্ন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও প্রশিক্ষক সম্পর্কে আগ্রহী হতে হবে।

৪. প্রশিক্ষণের বিষয় হবে মানের ধারণা, সার্বিক মান ব্যবস্থাপনার কৌশল, মান সতর্কতা, নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, যোগাযোগ পদ্ধতি, ব্যক্তিক ভূমিকা, পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি, মান বজায় রাখার জন্য প্রেষণা, মান রক্ষার প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

৫. টিমের নেতার জন্য নেতৃত্ব বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যার বিষয় হবে মানব সম্পর্ক, নেতৃত্ব, দ্বন্দ্ব নিরসন ব্যবস্থা, প্রেষণা, যোগাযোগ, জনসংযোগ ও অন্যান্য বিষয়।

৬। সুপারিশ ব্যবস্থা (Suggestion System)

সংগঠনের সার্বিক মান ব্যবস্থাপনার কাজে কর্মচারিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি হলো সুপারিশ ব্যবস্থা। কর্মচারিদের কার্যক্ষেত্রের মানোন্নয়নে তাদের সুপারিশ অনেক অবদান রাখে। এই সুপারিশ ব্যবস্থা কার্যকর ভাবে ব্যবহার করার জন্য কিছু নিয়মকানুন অনুসরণ করা দরকার। সেগুরো নিচে দেয়া হলো ঃ

১. অগ্রগতিশীল হতে হবে ঃ সুপারিশ করার জন্য কর্মচারিদের বারবার বলতে হবে। শুধু সুপারিশ বাক্স দিয়ে এটাকে কার্যকর করা যাবে না।

২. ভয় দূর করতে হবে ঃ কর্মচারিদের খোলা মনে সংগঠন সম্পর্কিত যে কোন মানোন্নয়ন চিন্তা সুপারিশ করতে হবে। ব্যবস্থাপনা এই মর্মে নিশ্চয়তা দিবে যে, কর্মচারিদের তাদের প্রদত্ত সুপারিশের জন্য শাস্তি দেয়া হবে না। তাদের মন থেকে সব ধরনের ভয় দূর করতে হবে।

৩. প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে ঃ সুপারিশ প্রদান প্রক্রিয়া সহজ করলে কর্মচারিরা উৎসাহের সাথে এর সঙ্গে জড়িত হবে। এজন্য সুপারিশ করার জন্য অতিরিক্ত দলিল ও কাগজপত্র প্রদান কমাতে হবে এবং সুপারিশ পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় ও জটিলতা কমাতে হবে।

৪. দ্রুত প্রত্যুত্তর দিতে হবে ঃ সুপারিশ পাওয়ার পর তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় কম নিতে এবং দ্রুত উত্তর জানাতে হবে। যদি গৃহীত হয়, তবে বাস্তবায়নের সময় কাটামো জানাতে হবে; যদি প্রত্যখ্যাত হয়, তবে তার কারণ জানাতে হবে; এবং যদি কোন কমিটিতে প্রেরণ করা হয়, তবে মূল্যায়নের সময় জানাতে হবে।

৫. নবচিন্তাকে পুরস্কৃত করতে হবে ঃ পুরস্কার সব সময় মানুষকে প্রণোদিত করে। তাই, নবচিন্তাকে পুরস্কৃত করলে কর্মচারিরা উৎসাহিত হয়ে সুপারিশ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করবে।

৭। স্বীকৃতি ও পুরস্কার (Recognition and Rewards)

স্বীকৃতি কর্মচারি প্রেষণার একটি ধরন যেখানে সংগঠন একজন কর্মচারি বা একটি টিমের সাংগঠনিক সাফল্যে ইতিবচক অবদানকে জনসমক্ষে স্বীকার করে। এই স্বীকৃতির পুরস্কার দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উপাদানে দেয়া যায়। দৃশ্যমান পুরস্কার হলো নগদ অর্থ প্রদান, লাভের অংশ প্রদান, গাড়ী বা বাড়ি উপহার, কর্মঘন্টা হ্রাস, মেডেল, স্মারক ফলক বা পত্র, ব্যক্তি ভিত্তিক পদোন্নতি ইত্যাদি। আর অদৃশ্যমান পুরস্কার হলো জনসমক্ষে প্রশংসা, মানভিত্তিক পদোন্নতি, কর্যোন্নতি ভিত্তিক মূল্যায়ন, সাফল্যের আনুষ্ঠানিক উদ্‌যাপন ইত্যাদি।

এই স্বীকৃতির পুরস্কার ব্যক্তি পেতে পারে, আবার টিম পেতে পারে। ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করার নানা রকম হলো নগদ অর্থ, মেডেল, ভাল পার্কিং জায়গা, বাইরে ডিনার করানো, উপহার, উপহার সনদ, প্রাপকের নামে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান, বাইরে ভ্রমণ করার জন্য টিকেট ও অন্যান্য ব্যয় বহন, কাগজে ছবি ছাপানো, পরিবারকে পত্র প্রদান, প্রধান নির্বাহী কর্তৃক ব্যক্তিগত ফোন করা, খবরের কাগজে বা কোম্পানির নিউজ লেটারে প্রবন্ধ প্রকাশ, কোম্পানির বুলেটিন বোর্ডে ছবি টাঙানো, ব্যক্তিগত নথিতে ইতিবাচক মন্তব্য লেখা, বর্ধিত দায়িত্ব দেয়া ইত্যাদি। আর টিম পুরস্কার হলো ব্যক্তিকে পুরস্কারের প্রকারগুলোর পাশাপাশি দলীয় মধ্যাহ্ন ভোজ বা সান্ধ্যভোজ, দলীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা ইত্যাদি।

স্বীকৃতি ও পুরস্কার ব্যবস্থাকে কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য করতে হলে যে কাজগুলো করতে হবে সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

১. স্বীকৃতি ও পুরস্কার ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে কর্মচারিদের সম্পৃক্ত করতে হবে। একটি বহুকার্যমাত্রিক লোকজন নিয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে এটি করতে হবে।

২. স্বীকৃতি ও পুরস্কার ব্যবস্থা সহজ ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতামুক্ত হতে হবে। নির্বাচন শর্ত, নীতি, প্রক্রিয়া মানোন্নয়ন কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে ও সবার জন্য সমান হতে হবে।

৩. স্বীকৃতি ও পুরস্কার দাতা ও গ্রহীতার কাছে অর্থপূর্ণ, সিদ্ধ ও খাঁটি হতে হবে।

৪. স্বীকৃতি ও পুরস্কার মানোন্নয়ন অবদানের মাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৮। কার্যপারদর্শিতা মূল্যায়ন (Performance Appraisal)

কর্মচারিদের কার্যপারদর্শিতা মূল্যায়ন সার্বিক মান ব্যবস্থাপনার সাথে কর্মচারিদের জড়িতকরণে একটা শক্তিশালী উপকরণ। কার্যপারদর্শিতা মূল্যায়ন করে ব্যক্তি বা টিমের কাজের মান, ভালোমন্দ যাঁচাই বাছাই করা যায় ও কর্মচারিদের পুরস্কার প্রদান বা উন্নয়ন করার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা যায়। তবে, এজন্য একটা উদ্দেশ্যমুখী, কার্যকর, বাস্তবানুগ, সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও কর্মচারিদের অংশগ্রহণে প্রণীত কার্যপারদর্শিতা মূল্যায়ন ব্যবস্থা দরকার।

৯। মুনাফার শরিকানা (Gainsharing)

প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিদের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে ও কাজে জড়িত করতে মুনাফার একটা ভাগ দেয়ার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থাকে মুনাফার শরিকানা বলে। এটি একটি আর্থিক প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা। এটি বাৎসরিক ভিত্তিতে দেয়া হয়, আবার চাকুরীর শেষে দেয়া হয়, আবার উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে মিশ্রিত পদ্ধতিতেও দেয়া হয়। এই প্রণোদনার ফলে কর্মীরা কাজে উৎসাহিত হয়, প্রতিষ্ঠানের উন্নতির প্রতি অধিক মনোযোগী হয়, প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য বাড়ে, প্রতিষ্ঠানকে নিজের ভাবতে শুরু করে এবং সাংগঠনিক কাজে উৎসাহের সাথে জড়িত হয়ে এর প্রগতি ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করে। ফলে, সাংগঠনিক মুনাফা বাড়ে, প্রতিষ্ঠানিক স্থায়িত্ব দীর্ঘ হয় এবং সার্বিক মান ব্যবস্থাপনা সফল হয়।

৯। ইউনিয়নের অংশগ্রহণ (Union Involvement)

যে সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ইউনিয়ন আছে তাদেরকে এই কর্মচারি জড়িতকরণ কর্মকান্ডে অংশী করতে হবে। এ জন্য মান কাউন্সিলে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে এবং সার্বিক মান ব্যবস্থাপনার সকল কাজে কাজে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

সারসংক্ষেপ:

ক্ষমতায়ন বলতে স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যক্তিক সক্ষমতা তৈরি করাকে বোঝায়। কর্মচারি জড়িতকরণ কাজকে ফলপ্রসু করার জন্য টিম খুবই কার্যকর। কোন একজন ব্যক্তির জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে একটি কাজ যখন করা যায় না, তখন প্রয়োজনীয় বহুমুখী জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক নিয়ে টিম গঠন করা হয়। টিম নানা ধরনের হতে পারে। কর্মচারি জড়িতকরণের আর একটি পদ্ধতি হলো সুপারিশ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, স্বীকৃতি ও পুরস্কার ব্যবস্থা, কার্যপারদর্শিতা মূল্যায়ন, মুনাফার শরিকানা ইত্যাদি। যে সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ইউনিয়ন আছে তাদেরকে এই কর্মচারি জড়িতকরণ কর্মকান্ডে অংশী করতে হবে।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. কর্মচারি জড়িতকরণ কাকে বলে ?
২. কর্মচারি জড়িতকরণে ব্যবস্থাপকের ভূমিকা আলোচনা কর।
৩. কর্মচারি জড়িতকরণের সুবিধাবলি বর্ণনা কর।
৪. প্রেষণা কাকে বলে ?
৫. প্রেষণার চাহিদা সোপান তত্ত্ব কিভাবে কর্মচারি জড়িতকরণকে সহায়তা করে তা ব্যাখ্যা করুন।
৬. প্রেষণার দ্বি-উপাদান তত্ত্ব কিভাবে কর্মচারি জড়িতকরণকে সহায়তা করে তা ব্যাখ্যা করুন।
৭. কর্মচারি জড়িতকরণে ব্যবস্থাপকের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৮. চাহিদার নানা উপাদানের প্রতি কর্মচারি ও ব্যবস্থাপকদের দৃষ্টিভঙ্গির চিত্রটি বর্ণনা করুন।
৯. প্রেষিত শ্রমশক্তি পাওয়ার উপায় কি কি ?
১০. কর্মচারি জরিপ পদ্ধতিটি বুঝিয়ে বলুন।
১১. ক্ষমতায়ন বলতে কি বোঝ ? ক্ষমতায়ন করার দিকনির্দেশনা কি কি তা বর্ণনা কর।
১২. টিম কাকে বলে ?
১৩. টিমে সিদ্ধান্ত নেয়ার পদ্ধতিগুলো কি কি ?
১৪. টিম গঠন করা হয় কেন ?
১৫. সফল টিমের বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা কর ?
১৬. টিম সদস্যদের ভূমিকা আলোচনা কর।
১৭. টিমের সভা কার্যকর করা যায় কিভাবে ?
১৮. টম অগ্রগতির সাধারণ প্রতিবন্ধকতাসমূহ বর্ণনা কর।
১৯. কার্যকর ও ফলপ্রসু প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যে দিকনির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে তা বর্ণনা কর।
২০. সুপারিশ ব্যবস্থা কার্যকর ভাবে ব্যবহার করার জন্য কিছু নিয়মকানুন অনুসরণ করা দরকার। সেগুরো বর্ণনা কর।
২১. কার্যপারদর্শিতা মূল্যায়ন করা দরকার কেন এবং এটি কি ভাবে কর্মচারি জড়িতকরণে সহায়তা করে?
২২. স্বীকৃতি ও পুরস্কার কাকে বলে ? স্বীকৃতি ও পুরস্কার ব্যবস্থাকে কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য করতে হলে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে?
২৩. মুনাফার শরিকানা পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করুন।